বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, অগাস্ট - সেপ্টেম্বর ২০১৩ মূল্য ₹১০

Vol.2, Issue 3, RNI No.WBBEN/2012/42493, Aug - Sep 2013, Price ₹10/- only

প্রভুবার্তা

দুর্গাপুর ঃ
গ্রীষ্মকালীন শিবিরে D.P.S. এবং S.K.S. স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের 'দক্ষতা বর্ধন' বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন বি. কে. চন্দ্রা।

শামুকপোতা ঃ
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা সব্যসাচী চক্রবর্তী মহাশয়কে ঈশ্বরীয় আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বি. কে. অঞ্জনা সঙ্গে বি. কে. ইন্দু।

পূর্ণ গ্রাম বিকাশ আধ্যাত্মিক সম্মেলন

হলদিয়া ঃ
'সম্পূর্ণ গ্রাম বিকাশ আধ্যাত্মিক সম্মেলন'-এ ভাষণ দিচ্ছেন মাউন্ট আবু থেকে আগত বি. কে. রাজু; সঙ্গে বি. কে. ভারতী ও ভ্রাতা স্বপন মাঝি (মৎস্যবিভাগ আধিকারিক, মহিষাদল)।

কোচবিহার ঃ
সমাজসেবক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ভ্রাতা নিখিল কুমার দে এবং তাঁর সহধর্মিনী ভগিনী নীলা দে - কে ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করছেন বি. কে. শম্পা।

সম্পাদকীয়

সঙ্গম যুগ হল উৎসবের যুগ। বিশেষ করে আগষ্ট মাস হল উৎসবের মাস। সকলকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় আনাই হল উৎসবের মূল লক্ষ্য। উৎসবের দুটি ধারা। প্রথমটি হল অর্থপূর্ণ ধারা। এই ধারায় মূল লক্ষ্যকে করায়ত্ত না করা পর্যন্ত তা চলতে থাকে। লক্ষ্যপূরণ হয়ে গেলে আর পালন করা হয় না। যেমন সঙ্গম যুগের সর্ববৃহৎ সর্ববৃহৎ 'শিবজয়ন্তী' উৎসব। এই উৎসবের মহতী অভীষ্টপূরণের পর সত্যযুগ ও ত্রেতযুগে এই উৎসব পালিত হবে না। দ্বাপর যুগ থেকে ওই উৎসবের দ্বিতীয় ধারাটি স্থূলরূপে অনুকরণ হিসাবে পালিত হবে।

শিবজয়ন্তীর রেশ ধরে 'রক্ষাবন্ধন' বা 'রাখি উৎসব' এসে গেল। বর্তমান বিশ্বের ঘোর সংকটের সময় ভগবান রক্ষাবন্ধন দান করেন। মন-বচন-কর্মে সার্বিক 'পবিত্রতা' ধারণই হল প্রকৃত রক্ষাবন্ধন। সর্বদা পবিত্রতা রক্ষা করার প্রতিজ্ঞাই হল 'রাখি' উৎসব। বোন ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে শপথ করিয়ে নেয়, যে কোন মূল্যে বোনের পবিত্রতা ভাইকে রক্ষা করতেই হবে।

রাখি উৎসব মর্যাদার সাথে পালনে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দুনিয়ার শুভারম্ভ হয়। জন্মাষ্টমী সমাগত হয়। সম্পূর্ণ নির্বিকার পবিত্র ও সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি মহাধূমধামে পালিত হবে। বাস্তবে অদূর ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে আবির্ভূত হতে চলেছেন, তার জন্য প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে।

সার্বিক পবিত্রতা ধারণ করে সারা বিশ্বকে কীভাবে পবিত্র করার সেবা করতে হয় তা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হয়েছেন তিনি হলেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় পরম শ্রদ্ধেয়া সম্মানীয়া দাদি প্রকাশমনিজি। তাঁর সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন হওয়ার পুণ্যতিথি এই আগষ্ট মাস। তাঁকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি আমাদের প্রেরণার স্রোত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের মাস আগষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বিদেশী বিতাড়ন করে কষ্টার্জিত স্বাধীনতালাভ করেছে। কিন্তু কোথাও স্বাধীনতার মূল স্বাদ সুখশান্তি লাভ করেনি। স্বপ্নসুন্দরীর ন্যায় অধরাই থেকে গেছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাকার সংস্থাপক পিতাশ্রী ব্রহ্মা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের ডাক দিয়েছেন ৭৬ বছর পূর্বে। তাঁর নির্দেশিত পথ ছিল আত্মজ্ঞানের আধারে আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধির আধারে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্বিকার জীবন লাভই হল পূর্ণ স্বাধীনতা যা আমরা অর্জন করতে চলেছি। ভরা এই উৎসবের মাসে 'প্রভুবার্তা'র সকল পাঠকের প্রতি রইল হার্দিক শুভেচ্ছা।

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচী

১। সম্পাদকীয় ১

২। সঞ্জীবনী বুটি ২

৩। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্ম ও জীবন ৩

৪। ব্যবহারিক জীবনে দাদি প্রকাশমণিজির শিক্ষা ৫

৫। স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ ৬

৬। আশীর্বাদ এক বিশেষ সম্পদ ৭

৭। প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির ৮

৮। সদা খুশিতে থাকার তাৎপর্য ১০

৯। আত্মা যে রথী (কবিতা) ১১

১০। মহাসংকট মোচনে রাখিবন্ধন ১২

১১। আদিদেব ১৪

১২। সময়কে ব্যর্থ নষ্ট করার অর্থ অন্তর্নিহিত শক্তিকে নষ্ট করা ১৬

১৩। বিনয়ী রাষ্ট্রপতি ১৭

১৪। প্রভুমিলন ১৮

১৫। সর্বশক্তিমান কে ? ২০

১৬। ভরা থাক স্মৃতি সুধায় ২২

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসৃত

Important Information :
All Email communications
for this Bengali
Magazine (Prabhubarta)
must be sent to
bm@bkprabhubarta.org only
Phone : 033-2475 3521
033-2474 5251
Annual Subscription : ₹60/-

প্রচ্ছদ পরিচিতি

যোলকলা সম্পন্ন, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ময়ূরমুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ।

সঞ্জীবনী বুটি

মহারথীর প্রধান লক্ষণ - কোন বিষয় তাঁর কাছে নতুন মনে হয় না। পূর্বকল্পের স্মৃতি তাঁর এতটাই স্পষ্ট মনে হবে যেন এক সেকেন্ড অতীত হওয়া কোন ঘটনা। কারণ, মহারথী সাক্ষী ও ত্রিকালদর্শী হন ।

সঞ্জয়ের কলম থেকে ...

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্ম ও জীবন

জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন রূপে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দারুণ ধূমধাম করে পালন করা হয়। এই দিনটিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বিশেষ ভাবে মধুর চর্চা করা হয়, কারণ দেবতাগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মহিমাযোগ্য। ভারতবাসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ অতীব প্রিয় কারণ তাঁর সতোগুণী কলেবর, সৌম্যদর্শন, হৃদয়হরণকারী স্মিতহাসি, শীতল স্বভাব সবার মনকে মোহিত করে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে ধন্য বলা হয়

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকে মানুষ ধন্য জ্ঞান করেন কারণ তাঁর জন্মস্থানাদি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘ধন্য মথুরা’, ‘ধন্য গোকুল’। তাঁর জন্ম, বাল্য অবস্থা এবং তাঁর সারাজীবনকে দুনিয়ার লোক দৈবী জীবন হিসাবে গণ্য করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে এতটাই মহান ও প্রিয় যে তাঁকে বর্ণনা করতে গিয়ে নামকরণ করেন ‘ময়ূর মুকুটধারী’, ‘মুরলীধারী’ প্রভৃতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যে বিশেষ বিশেষতা ও ব্যতিক্রমী মহানতা ছিল তা আজও বহু মানুষ সুস্পষ্ট রূপে জানেন না। জানেন না, কেন তিনি এতটাই আকর্ষণীয় ছিলেন? কোন সাধনা বলে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ হয়েছেন? এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এর রহস্য উন্মোচন করব।

গায়ন ও পূজন যোগ্য জীবনের অন্তর

কোন নগর বা দেশের জনতা তাঁর জন্মদিন পালন করেন যাঁর জীবনে কিছু মহানতা থাকে। মহান ব্যক্তিও দুধরনের হয়ে থাকে। এক হল ঃ যাঁর জীবন জনসাধারণের থেকে বেশ কিছু উচ্চ স্তরের কিন্তু তাঁর মন পূর্ণরূপে বিকার মুক্ত নয়; সংস্কার সম্পূর্ণ পবিত্র নয়; বিকর্মজিৎ নয়, সর্বোপরি তাঁর দেহকলেবর সতোপ্রধান তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত নয়। এঁরা দেবতা নন। আর জনসাধারণও এঁদের দেবতারূপে মানেন না। কারণ এঁদের জন্ম অপবিত্র পদ্ধতিতে (মৈথুন) হয়েছে। কিন্তু বিশেষ গুণ ও কর্তব্যের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের সারা দুনিয়ায় গায়ন হয়, পূজন হয় না। পূজন হয় দেবীদেবতার এবং দেবীদেবতাদেরও রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা ভগবানের।

দ্বিতীয় প্রকার মহান হলেন ঃ তাঁরা যাঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার, সতোপ্রধান সংস্কারসম্পন্ন এবং জন্ম কামবাসনা রহিত যোগবল থেকে। এঁদেরই দেবতা বলা হয়। এঁরাই গায়ন ও পূজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি তথা অন্যান্য মহাত্মাগণে জীবন শুধু গায়নযোগ্য।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, প্রথম প্রকারের ব্যক্তিগণ বাল্যকাল থেকেই গায়ন বা পূজনযোগ্য হন না; পরবর্তী জীবনে বিশেষ সাড়া জাগানো কর্মের জন্য দেশবাসী বা নগরবাসী তাঁদের জন্মদিন পালন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে এরূপ নয়। তাঁরা বাল্যকাল থেকেই মহাত্মা ছিলেন। কোন কিছু ত্যাগ করে বা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা

নেওয়ার পর পূজনযোগ্য হননি। সকলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন - তাঁরা তাঁদের বাল্য অবস্থাতেই 'প্রভামণ্ডল' দ্বারা সুশোভিত কিন্তু অন্যান্য মহাত্মাগণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোন কিছু ত্যাগের পর বা বিশেষ কিছু করার পর তাঁদের প্রভামণ্ডল দ্বারা সজ্জিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য অবস্থাকে এজন্যই মায়েরা খুব স্মরণ করেন এবং ভগবানের কাছে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা রাখেন শ্রীকৃষ্ণের মত যেন এরূপ একটি সন্তান লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য অবস্থার সাথে অন্যদের বাল্য অবস্থার মূলগত তফাৎ হল, শ্রীকৃষ্ণের শরীর সতোপ্রধান তত্ত্ব দিয়ে তৈরি এবং সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার কারণেই তাঁর মা তাঁর জন্মকালেই দিব্যসাক্ষাৎকার দ্বারা বিষ্ণু চতুর্ভুজের দর্শন করেছিলেন। অন্যান্য মহাত্মাগণের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের ময়ূর মুকুট দ্বারা তাঁর পবিত্রতা সিদ্ধ হয়

ময়ূরের পেখম পবিত্রতারই প্রতীক। আরতি করার সময় এবং ধর্মগ্রন্থের উপর অনেকে চামর দোলায়। চামর ময়ূরের পেখম দিয়েই তৈরি হয়। অনেকে পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে ময়ূরের পেখম রাখেন, এর কারণ হল বহু মানুষ মানেন ময়ূর পবিত্র পাখি। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের মুকুটে ময়ূরের পেখম শোভা পায়। এরূপ মান্যতার মূল রহস্য হল ময়ূরের জন্ম মৈথুন দ্বারা কিংবা কামবাসনার দ্বারা হয় না। আর একটি বিষয় 'প্রভামণ্ডল'ও নির্বিকারের সূচক। 'শ্রী' কথার অর্থ হল শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন এবং কাম বিকার থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তাই কৃষ্ণের নামের পূর্বে 'শ্রী' উপাধি যুক্ত করা হয়। আজকাল 'শ্রী' বসালে তাকে কেটে মিস্টার শব্দ বসানো হয়। প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের নামের পূর্বেই 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ বাস্তবসম্মত। কারণ তাঁদের জীবন পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ।

> *প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের নামের পূর্বেই 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ বাস্তবসম্মত। কারণ তাঁদের জীবন পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ*

শ্রীকৃষ্ণকে 'বৈকুণ্ঠনাথ' বলা হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় তাঁর জন্ম পূর্ণ পবিত্রতায় হয়েছিল। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে - যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত তাঁরা কামবিকারকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে ভক্তি করেছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কীভাবে কামবিকারে সম্ভব? জ্বলন্ত উদাহরণ মীরা। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করার জন্য তিনি বিষের পেয়ালা অবলীলায় স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তির জন্য, তাঁর ক্ষণিক সাক্ষাতের জন্য, তাঁর সাথে স্বল্প সময়ের রাস করার জন্য কামবিকারকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দিতে হয়। তাহলে ভাববার বিষয় - শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা, আত্মীয়-পরিজন, পাত্রমিত্র প্রমুখ কীভাবে কামবিকারযুক্ত হতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিকে আজও পর্যন্ত কোন কামবাসনা যুক্ত ব্যক্তিকে ছুঁতে দেওয়া হয় না। তার পরিচর্যা করা তো দূরের কথা কোন মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জড় মূর্তির সামনে কোন ব্যক্তির কাম বিকারের সংকল্প করা আজও পর্যন্ত মহান পাপ হিসাবে গণ্য হয়। তাহলে সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপের উপস্থিতিতে ভারতভূমি রূপ বিশাল মন্দিরে কোন কাম ও কামী কীভাবে উপস্থিত থাকবে? অতএব সামগ্রিক বিচারে প্রমাণ হয় শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। বহুল প্রচলিত একটি বাক্য - যেখানে শ্যাম সেখানে কাম নেই, যেখানে কাম সেখানে শ্যাম নেই।

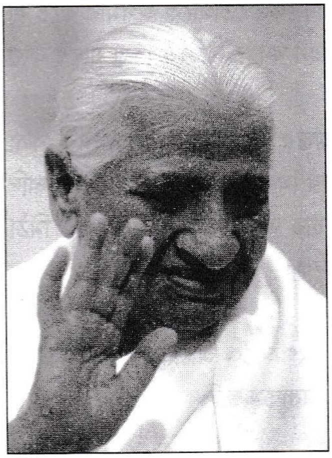

ব্যবহারিক জীবনে দাদি প্রকাশমণিজির শিক্ষা

-ব্রহ্মাকুমারী কানন
কলকাতা মিউজিয়াম

ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হওয়ার পর প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশাল যজ্ঞের দায়িত্ব ন্যস্ত হল দাদি প্রকাশমণিজির উপর। বললে অত্যুক্তি হবে না - সুবিশাল দায়িত্ব সুযোগ্যার হাতে অর্পিত হয়ে সঠিক পরিণতি লাভ করেছিল। পৃথিবীর সাড়া জাগানো এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বড় বড় বিষয়গুলির প্রতি যেমন দাদির বিশেষ নজর ছিল ঠিক তেমনি ছোটখাট খুঁটিনাটি ব্যাপারে দাদি ছিলেন সমান আন্তরিক। দাদি জানতেন, বড় ও ছোট যথার্থ সব কাজ মিলিয়েই যজ্ঞের উন্নতি ও বৃদ্ধির ভিত্তি। দাদির কাছ থেকে আমি বড় ও ছোট কাজ শেখার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। কলকাতায় একাধিক বিভিন্ন সময়ে ‘মেলা’-র আয়োজন করার সময় মিঠা দাদির বহু শিক্ষা আমাকে প্রেরণা দিয়ে অনুভাবী করেছে, ঠিক তেমনি ছোটখাট বিষয়ের শিক্ষাও আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি গুটি কয়েক বিষয়ের স্মৃতিচারণা করছি।

১। দাদিজি টিচার বোনেদের ক্লাসে একবার প্রশ্ন রেখেছিলেন - বোনেরা বল, আমাদের ঈশ্বরীয় আধ্যাত্মিক পড়াশুনায় প্রধান সাবজেক্ট কোনটি ? এক একজন এক একরকম উত্তর দিয়েছিল। কেউ বলল - জ্ঞান, কেউ বলল - যোগ... । দাদিজি উত্তরে বললেন, সর্বোচ্চ সাবজেক্ট হল আমাদের ‘ব্যবহার’। যখনই আমাদের ব্যবহার মিঠা ও স্নেহের হবে, তখনই আমরা ঈশ্বরীয় সেবা করতে পারব। বাবা বলেন, সবার সাথে মধুর ব্যবহার করো।

২। দাদিজি কোন একবার এলগিনের সেবাকেন্দ্রে এসেছেন, ছোটদের দিয়ে ‘স্বাগত নৃত্য’ পরিবেশন করানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর দাদি দেখলেন ছোট্ট একটি মেয়ে একান্তে কান্নাকাটি করছে। দাদিজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাচ্চাটি কাঁদছে কেন ? বললাম, দাদি মেয়েটি দুটো নাচ তৈরি করে এসেছে, একটি নাচ পরিবেশন করেছে, সময়ের অভাবে আর একটির পরিবেশন সম্ভব হয়নি। মাতৃময়ী, করুণাময়ী, প্রেমময়ী দাদিজি সকলকে খুশি করার জন্য সেই মেয়েটিকে কাছে ডেকে স্নেহ দিয়ে বললেন, আমি তোমার নাচ দেখব। মেয়েটি নৃত্য পরিবেশন করল। দাদি তাকে উপহার ও টৌলি দিলেন। মেয়েটি খুশিতে উদ্বেল। সভার পরিবেশটাই প্রেমময় ও আনন্দময় হয়ে উঠল। ভাবছিলাম এত আদর স্নেহ আর কে-বা দেবেন! দাদি এতটাই স্নেহ, সরল প্রেমের ভাণ্ডার ছিলেন।

৩। দাদির দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ ইতিবাচক ছিল। যদি কোন বোন অসুস্থ হ’ত দাদি বলতেন, ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে নাও। ডাক্তার দেখলেই অর্ধেক রোগ সেরে যাবে। বাকিটা ওষুধ খেয়ে নাও দেখবে সুস্থ হয়ে উঠবে।

৪। জ্ঞানমার্গে চলতে দাদি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দিতে বলতেন - শোন, সহন কর, আত্মীকরণ কর। যদি কেউ তার নিজের দুর্বলতা তোমাকে শোনায়, তুমি তা

দ্বিতীয় কান করবে না। প্রথমে ভালোভাবে শোন। যদি কেউ তোমাকে অপমান করে বা ব্যথা দেওয়ার কথা বলে তাহলেও তা সহন কর। সহন করার শক্তিও কিন্তু ধারণ করা চাই।

৫। দাদি বলতেন, ভুল হয়ে গেলে মুখ দিয়ে নয় অন্তর দিয়ে 'সরি' বল। 'সরি' বলা মানে হারমনি হয়ে গেল। অর্থাৎ হার মানলাম আবার মিল বা ঐক্যও হয়ে গেল। দাদি বলতেন, যদি কেউ তোমার সাথে কথা বলতে না চায় তবুও তুমি এগিয়ে যাও মিঠা করে তাকে 'ওম্ শান্তি' বল। সে উত্তর দিক বা না দিক।

ছোট ছোট বিষয়ের যে শিক্ষা দাদিজি দিয়েছেন তা সংগঠনকে আরো বেশি একতা ও স্নেহের রজ্জুতে বেঁধে মজবুত করেছে যা সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ

(অব্যক্ত মুরলী ১৯-২-১২)

যাঁরা অ্যাডভান্স চলে গেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা 'ঘরের দরজা' কবে খোলা হবে ? তাঁদের সম্মিলিত প্রশ্ন, ঘরে যাবার জন্য কোন তারিখ স্থির করা হয়েছে ? সবাই তারিখ জানতে চাইছেন।

দরজা খোলার চাবি হল - 'বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি'। অতএব বেহদের বৈরাগী হয়ে ব্যর্থ সংকল্প ও ব্যর্থ সময় যত সত্ত্বর পার ত্যাগ কর।

বাপদাদা দেখেছেন সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হল 'দেহ-অভিমান'। এই দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে চলতে ফিরতে 'দেহী-অভিমানী' হতে হবে। এটাই বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি। দেহ-অভিমান যা 'আমি' রূপে আসে অর্থাৎ আমি যা করছি, আমি যা বলছি ওটাই ঠিক। এটা সূক্ষ্ম আমিত্ব। এই আমিত্ব আজ এই জন্মদিনে বাবাকে উপহার স্বরূপ দান কর।

ভাষণ দ্বারা, বাণী দ্বারা উৎসাহ-উদ্দীপনা রেখে যেমন ভাবে সেবার সফলতা পেয়েছ ঠিক একই ভাবে সময় অনুযায়ী এই সময় চেহারা ও চলন দ্বারা দারুণ সেবা হবে। এর অভ্যাস করো। চেহারা ও চলন দ্বারা কাউকে খুশির বরদান দাও, বলা এবং তার প্রেক্ষিতে করা 'এক করো'। প্রতিটি শুভকার্য দৃঢ়তা দ্বারা সফল করো।

কোন আত্মার সহযোগ প্রয়োজন হয় তো তাকে হৃদয় দিয়ে সহযোগিতা করে তীব্র পুরুষার্থী করে গড়ে তোল। প্রতিটি সন্তান তীব্র পুরুষার্থী হোক। মোহজিতের কাহিনি আছে না। সবকিছুতেই মোহমুক্ত। এরূপ দেখে যেন অন্যেরা তীব্র পুরুষার্থী হয়। লক্ষ্য থেকে লক্ষণ এসে যাবে। প্রতিটি সেন্টার সন্তুষ্টমণিদের সেন্টার হোক।

আশীর্বাদ এক বিশেষ সম্পদ

-ব্রহ্মাকুমার শিবপ্রকাশ
কলকাতা

ধনদৌলত অর্জনের নিত্য কর্ম তো করে চলেছি। কিন্তু শুভ কাজের দরুণ অন্যের অন্তরে আশীর্বাদের মূল্য সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান ছিল না। রাজযোগী নির্বের ভাইয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমার এই বিশেষ উপলব্ধি হয় যে অন্যের অন্তরের আশীর্বাদ ঔষধাদির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। জীবনে ধর্ম ও ঔষধাদির প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু কারুর আশীর্বাদ, যা অন্তর থেকে স্বতঃ প্রবাহ হয়, তা প্রাপকের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান সম্পদ। দুঃস্থ, নিঃসহায়দের কল্যাণ হেতু সেবাকার্যে তো খুশি স্বতঃই অনুভূত হয়। কিন্তু ঈশ্বরীয় সেবাকার্যে ধনের চেয়েও শারীরিক শ্রম ও ‘মনসা’ সেবা অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। আশীর্বাদ কোন স্থুল পদার্থ নয় যা বাজারে কেনা সম্ভব। এটা ব্যক্তির অন্তর থেকে নিঃসৃত কৃতজ্ঞতারূপী আশীর্বাদ যা ঝরে পরে সেই ব্যক্তির প্রতি যে বিশেষ কোন কল্যাণকারী বা শুভ কাজ করে কারুর মঙ্গল সাধন করেছে। এটা চাওয়া- পাওয়ার কোন বস্তু নয়। এটা ব্যক্তির অন্তর থেকে নিঃসৃত শুভ ভাবনার বর্ষণ। কেবল স্নেহভরে হাসিমুখে ওম্ শান্তি সম্বোধন চিত্তকে আনন্দ দেয়। স্থূল বস্তুর উপার্জন তো এই জন্মের কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু কারুর অন্তরের আশীর্বাদ তো চর্মচক্ষে দর্শনের বস্তু নয়, এ তো শুধু অনুভবের, এ তো সম্পদরূপে অনেক জন্ম ধরে আমার জমার খাতায় থাকবে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা স্থুল ধনদৌলত উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাত্মার উন্নতি সাধনের কাজ নিত্য করে যাওয়া। জীবনযন্ত্রণায় এক সময় আসে যখন শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে; কিন্তু অন্যের আশীর্বাদের সম্পদে সম্পদশালী হয়ে অন্তরাত্মার পরম উন্নতির প্রয়োজন তখন খুবই অনুভূত হয়। সুখ-শান্তির প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুরই চাহিদা থাকে না।

আত্মিক শক্তি প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যার মধ্যে প্রেম পরিপূর্ণ, সেই অন্যকে তা দিতে পারে বা তার লেনদেন করতে পারে। সাংসারিক জীবনে ধন উপার্জনের জন্য সচেষ্ট তো হতেই হয়। কিন্তু এককভাবে তা করা সম্ভব নয় - প্রয়োজন হয় সহযোগের। অধস্তন কর্মীবৃন্দ নিজের শ্রম ও বুদ্ধি সহযোগে আট ঘণ্টা নিয়মমাফিক তো কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মনে কোন অসন্তুষ্টি ও নিরাশাজনিত নেতিবাচক বিচার, সংগঠনের সুষ্ঠ কার্যধারা ও উন্নতিসাধনে বাধা স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। মনের ওইরূপ অবস্থা - গতানুগতিক কাজ করে মাস-মাইনে উপার্জন করার বাইরে আর কিছুই ভাবে না। পরিচালক নৈতিকমূল্যবোধের আধারে যদি সকলের সঙ্গে সমভাবে সহাস্যে বার্তালাপ করেন, তাদের ব্যক্তিজীবনের খোঁজখবর নেন, সহমর্মিতা দেখান, তাদের যথার্থ প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মানবিকতা প্রদর্শন করেন তবেই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান সংগঠনের উন্নতি সাধিত হতে থাকবে।

কারুর জন্য ভালো কাজ করতে না পারা, নিজের আত্মিক শক্তির অভাব ও নেতিবাচক বিচারের পরিণাম। সর্বশক্তিমান পরমাত্মা যখন মাতাপিতা রূপে আমাদের শক্তিশালী ও গুণবান তৈরি করতে এসেছেন, তখন নিজের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে যথাসাধ্য দূর করার কাজে সচেষ্ট হওয়া উচিত। পরমাত্মার সন্তানরূপে তো আমরা মাষ্টার সর্বশক্তিমান। শুদ্ধমনে পরমাত্মা শিববাবাকে সর্বসম্বন্ধে, প্রেমভরে স্মরণ করে, তাঁর জ্ঞান, গুণ, শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠুন ও জীবন প্রেমময় করে, অন্যজনকে প্রেম উপলব্ধি করাতে থাকুন।

প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির

পরম শ্রদ্ধেয়া, নিখিল বিশ্বের অতি প্রিয়, ভগবানের হৃদয়ে যিনি সদা বিরাজিত, ত্যাগ-তপস্যার প্রতিমূর্তি, নিমিত্তভাব, নির্মাণভাব ও নির্মল বাণীর মোড়কে এক মহার্ঘ হীরক খণ্ড ব্রহ্মাকুমারীজের প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসিকা রাজযোগিনী দাদি প্রকাশমণিজিকে তাঁর অব্যক্ত দিবস (২৫ আগস্ট) উপলক্ষ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। আমাদের কিছু প্রশ্ন দাদিজির উত্তর এখানে পরিবেশিত হল। -সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ চিন্তামুক্ত হওয়া কীভাবে সম্ভব ? বিধি কী ?

উত্তর ঃ কীসের নাম চিন্তা ? চিন্তা কেন করবে ? বাবা আমাদের সাথে, সুতরাং চিন্তার কোন বিষয়ই হতে পারে কি ? চিন্তামুক্ত থাকো, শরীর ও মন ঠিক থাকবে।

প্রশ্ন ঃ সদা হর্ষিত থাকার উপায় কী ?

উত্তর ঃ বাবা মিলেছে, সুতরাং সব পাওয়া হয়ে গেছে, দুনিয়ার কী সব প্রাপ্তি হয়েছে। বাবার স্মরণ থাকলে সদা হর্ষিত থাকবে।

প্রশ্ন ঃ দাদিজি, আপনি দাদি কীভাবে হলেন ?

উত্তর ঃ আপনারা সকলে মিলে করেছেন। বাবা সব যোগ্যতা দেখেছেন - যেমন, পালন করার, সামাল করার, সংগঠন চালানো, ফেথফুল থাকা - এসব যোগ্যতা বাবা ভরে দিয়েছেন আর সবাই দাদি বলা শুরু করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ক্রোধ মহাশত্রুর উপর কীভাবে জিৎ পাওয়া সম্ভব ?

উত্তর ঃ এর জন্য প্রথমেই যা চাই তাহল বুদ্ধিতে মজবুত থাকতে হবে, আমি শান্তিমূরত, সবাইকে শান্তির দান দিতে হবে নাকি রাগ করে অশান্তি আনতে হবে ! দুঃখও দেওয়া নয় আবার রাগও করা নয়। ১) ক্রোধকারীর জলের কলসী শুকিয়ে যায় ; ২) ক্রোধকারী পাপাত্মায় পরিণত হয় ; ৩) ক্রোধকারীর ভাষা মিঠা হয় না ; ৪) ক্রোধী ব্যক্তি খুশি অনুভব করে না ; ৫) ক্রোধী ব্যক্তি খিটখিটে হয় ; ৬) কারো সাথে স্নেহপূর্বক কথা বলতে পারে না।
বাবার আদেশ, বাছা, ক্রোধ করো না, ক্রোধ না করা মানে দুঃখ না দেওয়া, সবাইকে সুখ দাও, সুখে থাকো।

প্রশ্ন ঃ সংসারে অনেক রকমের কলহ-ক্লেশ, লড়াই-ঝগড়া তো আমরা কী বুঝব, বিনাশ কবে হবে ?

উত্তর ঃ কোন এক লহমায় যা কিছু হয়ে যেতে পারে, এজন্য সর্বদা এভাররেডি থাকো।

প্রশ্ন ঃ আকর্ষণমুক্ত কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর ঃ এক বাবার প্রতি ভালোবাসা হলে বাকি সবার থেকে আকর্ষণ দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি ভুল করে আপনার কাছে আসে তো আপনি তাকে কীভাবে বোঝান ?

উত্তর ঃ স্নেহ দিয়ে বুঝাই, ক্রোধ করে নয়! বোঝানোর পরেও যদি না বোঝে তো তাকে ছেড়ে দিই।

প্রশ্ন ঃ ব্যবহারে কুশলতার জন্য কী করা প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ ১) কোন কাজ করতে বা করাতে হলে ভালোবেসে করো এবং করাও, রিগার্ড রাখো। ২) যদি কেউ তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেও তাহলে ভেঙ্গে পড়া

নয় বা উদাস হওয়া নয়। ৩) সে যে ব্যবহারই করুক না কেন তুমি তার প্রতি ভালো ব্যবহার করো।

প্রশ্ন ঃ উদাস ভাব কেন আসে ?

উত্তর ঃ সেবা না থাকলে উদাস ভাব আসবে। কোন না কোন সেবার মধ্যে নিজেকে বিজি রাখো, দেখবে উদাস ভাব কেটে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সেবা কত প্রকারের হয় ?

উত্তর ঃ প্রথম সেবা হল, বাবা যেন সব সময় স্মরণে থাকে, মুখ দিয়ে জ্ঞান শুনিয়ে, হাতে-কলমে করে সবাইকে খুশি করো।

প্রশ্ন ঃ আমাকে নিয়ে যদি কেউ খুশি না হয় তাহলে কী করব ?

উত্তর ঃ এরকম হতে পারে না। তুমি নিজের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ শুভভাবনার সংকল্প রাখো।

প্রশ্ন ঃ শারীরিক রোগের উপর কীভাবে বিজয় পাব ?

উত্তর ঃ ভাবো, হিসাব-কিতাব চুক্ত হচ্ছে, কষ্টের সময় সহনশক্তি ধারণ করো।

প্রশ্ন ঃ আমাদের জীবনের সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ সবার সাথে মিঠা ও প্রেমের ব্যবহার করো, এর মধ্যে সব এসে যাবে। যদি কেউ আমার দ্বারা দুঃখ পায়, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করো - আমার উপর কেন তুমি সন্তুষ্ট নও? আমি মনোযোগ দেব তাকে সন্তুষ্ট করার।

প্রশ্ন ঃ আদর্শ ব্রহ্মাকুমারী কাকে বলবেন ?

উত্তর ঃ ১) যার স্মরণে একমাত্র বাবাই থাকেন ; ২) বাবার মুরলীর প্রতি প্রেম আছে; ৩) দাদির প্রতি ও ঈশ্বরীয় পরিবারের প্রতি প্রেম ; ৪) তাঁর থেকে ভাইব্রেশন আসবে এই বোন পবিত্র ও শুদ্ধ। আদর্শ মানে রয়্যাল। জ্ঞানে, যোগে, বোল-চাল, ব্যবহার সবকিছুতে রয়্যালিটি থাকবে।

প্রশ্ন ঃ সহনশক্তি কাকে বলা হবে ?

উত্তর ঃ বাবা আমাদের নলেজ দিয়েছেন সহনশক্তি ধারণ করার। কারণ, আজকের মানুষ রং-রাইট না বুঝে যা মনে আসে তা বলে দেয়। সহনশক্তি না থাকার কারণে কীসব ঘটে চলেছে। কিন্তু সহনশক্তি আয়ত্ত হলে সেকেন্ডে সে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে পারে। এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিতে পারে। যদি সহন না হয় তাকে দেহ-অভিমান বলে। দেহ-অভিমানী বলে উঠবেন, এ কেন এসব বলছে ? ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। অতএব এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে দূর করে দাও। যদি সহনশক্তি না থাকে তাহলে ব্যর্থ প্রশ্ন-উত্তর চলতে থাকবে, ঘরের বাতাবরণ পবিত্র, শুদ্ধ, শান্ত থাকবে না।

> *সহনশক্তি আয়ত্ত হলে*
> *সেকেন্ডে সে নিজেকে গুটিয়ে*
> *ফেলতে পারে*

প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মাবৎসগণের কোন ধারণার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি ?

উত্তর ঃ প্রথম বিষয় হল পবিত্রতার উপর। আমাদের মর্যাদার মধ্যে থাকতে হবে হাসি-মজা করে ফালতু টাইম নষ্ট করা নয়। গম্ভীর ও শান্ত থাকতে হবে। চেহারায় সদা খুশির ঝলক থাকবে। কারো অবগুণ দেখা নয়। একে অপরের প্রতি প্রেম থাকবে ঘৃণা নয়। আমাকেই বদলাতে হবে, এজন্য সহনশক্তি ধারণ করা চাই।

প্রশ্ন ঃ অবস্থা টালমাটাল না হয় এজন্য কী করা উচিত ?

উত্তর ঃ অবস্থা টালমাটাল হওয়া মানে বাবার বদনাম করা। স্থিতি 'একরস' থাকা মানে বাবার এবং জ্ঞানের গুণগান করা। বাবা বলেন, খারাপকে খারাপ দেখো না বরং প্রেমের আত্মিক দৃষ্টি দাও তো ফরিস্তা হতে থাকবে। ফরিস্তা চালে উড়তে থাকো।

সদা খুশিতে থাকার তাৎপর্য

- ব্রহ্মাকুমার অরুণ
গড়িয়া, কলকাতা

পরমাত্মা শিববাবা গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে যতবার বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর মহাবাক্য দ্বারা যত আদেশ নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিবারই বাচ্চাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তারা সবাই সব সময় খুশিতে ভরপুর থাকে নাকি 'কোন কোন সময়' খুশিতে থাকে। প্রত্যুত্তরে সবাই হাত উঁচু করে জানিয়েছিলো যে সবাই সবসময় খুশিতে ভরপুর থাকে।

বাবা বারবার কেন এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন তা বিচার করে দেখার প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা দেখেছি যখন কোন আত্মা অলৌকিক জীবনে প্রথম প্রবেশ করে তখন তাকে বেশ খুশি খুশি ও আনন্দের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে দেখা যায়। পরমপিতা পরমাত্মার আশ্রয়ে আসা ও ভবিষ্যৎ জীবনে দেবপদ প্রাপ্তির আনন্দে ভরপুর থাকাই তো স্বাভাবিক। এরপর তারা বাবার মুরলী শুনতে থাকে। বাবা আদেশ দেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের অমৃতবেলায় (অর্থাৎ ভোর দুটো থেকে পাঁচটার আগে পর্যন্ত) উঠে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে বা বাবার চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে তখন অনেকে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকার পর এত সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারবে কিনা এবিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেকে অভ্যস্ত হয়ে যায় আবার অনেকে পারে না। এই অক্ষমতার জন্য তাদের খুশিতেও প্রভাব পড়ে।

এরপর বাবা যখন নির্দেশ দেন যে তোমাদের সাচ্চা ব্রাহ্মণ হতে হবে ও ব্রাহ্মণ সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে থাকতে হবে। ব্রাহ্মণ আত্মাদের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে অশুদ্ধ আহার বর্জন করে চলতে হবে। অশুদ্ধ আহার সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে ঃ

১) **জাতিদোষ** - কতগুলো খাওয়ার পদার্থ আছে যা গ্রহণ করলে মনে দোষ উৎপন্ন হয়। যেমন, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস ইত্যাদি।

২) **আশ্রয়দোষ** - যাদের হাতে খাদ্য প্রস্তুত হয় তারা যদি দুষ্ট ও অসৎ চরিত্রের হয় তাও বর্জন করতে হবে।

৩) **নিমিত্তদোষ** - যে সব খাদ্য অপরিষ্কার অবস্থায় থাকে ও যার ওপর পোকা-মাকড় চলাফেরা করে ও মাছি বসে তাও বর্জন করে চলতে হবে।

ব্রহ্মাকুমারীরা ও কুমাররা বাইরের কোন আহার গ্রহণ করতে পারে না। অনেকের কাছে এই বিষয়টা মেনে চলা খুবই অসুবিধাজনক মনে হয়। এছাড়া দেহবোধ ত্যাগ করে দেহীবোধে থাকা, সম্পূর্ণ পবিত্রতা বজায় রাখা অর্থাৎ দেহে মনে, চিন্তায়, কথাবার্তায় নির্মলতা বজায় রাখা, অনেকে এসব বজায় রাখতে গিয়ে সব সময়ের জন্য খুশিতে না থেকে উদাস ভাব এসে যায়। আমাদের ৬৩ জন্মের পাপের বোঝা মাথায় থাকায় মাঝে মাঝে নানা অসুখ বিসুখ হতে থাকে। দেহের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে খুশিতে থাকা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায়। বাবা যদিও বলেছেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা এসব কর্মভোগ ও কর্মযোগ দ্বারা ও ওষুধের সাহায্য নিয়ে খুশি-খুশিতে পার করে দাও। বাবা আরও আশ্বাস দিয়েছেন যাদের এমন রোগ হয় যা তাদের কাছে শূল বেঁধার মত বেদনাদায়ক সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের কাছে শুধু সূচফোটার মত বোধ হবে। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা জ্বালামুখী যোগ দ্বারা সব পাপের বোঝা ভস্ম করে দাও।

এতসব শর্ত লক্ষণরেখার মধ্যে টিকে থাকার ক্ষমতা তাদেরই থাকবে যারা পূর্বকল্পেও এই কুলের মধ্যে ছিল। অন্য আত্মারা ধীরে ধীরে বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায় ও অশেষ দুঃখের পারাবারে তলিয়ে যায় ও দুঃখের সাগরে ডুবে মরে। অন্যরা তীব্র পুরুষার্থ করে প্রাপ্তিতে ভরপুর হয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে। বাবার প্রতি, মুরলীর প্রতি, অলৌকিক পরিবারের প্রতি, বিশ্বনাটকের প্রতি যাদের একশত ভাগ নিশ্চয়তা থাকে তাদের মধ্যে সবসময় চোখে, মুখে, সর্বশরীরে খুশির ঝলক বজায় থাকে। এরা সম্পূণতার কাছাকাছি চলে এসেছে বলে ধরে নিতে পারা যায়। আমাদে সকলের এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বনাটকের এখন অন্তিম অঙ্কের অভিনয় চলছে তাই বাবা বারবার নিশ্চিত হতে চান তার বাচ্চারা কতদূর এগিয়েছে। এটাই হল সদা খুশি থাকার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার তাৎপর্য বলে আমার বিশ্বাস।

আত্মা যে রথী

- ব্রহ্মাকুমার স্বপন
দুর্গাপুর

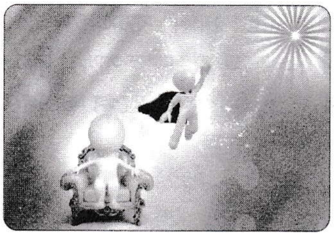

হলামই বা ক্ষুদ্র মানবদেহ বন্ধন যুক্ত
তবু হতে পারি কবি,
পৌঁছতে পারি অনেক দূরের আকাশে
শুধু মন বুদ্ধি নিয়ে - যা অনুভাবী।
দেহের তো অনেক বাধা - কখনো বা যাতনা
চারিদিকে সমস্যা আর বিপদ,
কিন্তু তার ভেতরে যার বাস - অতি সূক্ষ্ম আত্মা
সেইটি যে মস্ত গুণী - অমূল্য সম্পদ।
সবকিছুর ছাপ সেই আত্মাতেই থাকে
যা কল্প জুড়ে বেজেই চলে,
জীবনে-মরণে, স্বপ্নে-জাগরণে
সে নিজের কথা নিজেই বলে।
দেহ তো আর বোঝে না কিছু -
যা করায় সেটিই করে,
একটু অন্যরকম হলেই সে যে
ছটফটিয়ে মরে।
আত্মারথী চুপ করে মজা দেখে
ভ্রূকুটি মাঝে অস্থায়ী আসনে,
যখন তার সময় হবে চলে যাওয়ার
যাবে সে উড়ে ফুড়ুৎ করে দেহকে রেখে শবাসনে।
কোথাও সে চিরস্থায়ী ঘর বাঁধেনা
আনন্দ যে তার চলাচলে,
কত জন্ম পার করেও তাইতো সে
রয়ে যায় একই আদলে।

মহাসংকট মোচনে রাখিবন্ধন

- *ব্রহ্মাকুমার শিবু*
কলকাতা

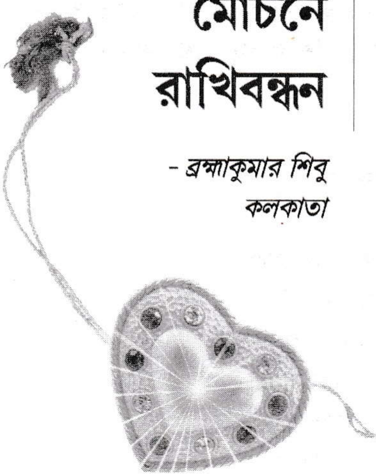

বারো মাসে তেরো পার্বণের চক্রের নিয়ম ধরে আবার রাখিবন্ধন উৎসব সমাসন্ন। মহাধূমধাম করে পালিত হবে, আবার সে নীরবে চলেও যাবে। ঘটা করে ওই দিন বোন স্নানাদি করে পবিত্র মন নিয়ে ভাইয়ের প্রতি বিশাল শুভভাবনা শুভকামনা রেখে, দারুণ খুশি ও আনন্দে 'ভাইবোনের পবিত্র অটুট বন্ধন' স্মরণ করে তার হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। আনন্দঘন নির্মল উল্লাসে পরিবেশের বাতাবরণ একটা বিশেষ মাত্রা পায়। ভাইবোনের মধ্যে যদি মনোমালিন্যও থাকে তাহলে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তা জল হয়ে যায়। সুতরাং এই উৎসবের পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা মূল্য আছে। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই উৎসবের যে এক আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব আছে তা আজ আর কেউ মনে করে না। বাস্তবে ইহা এক উচ্চকোটির উৎসব এবং ইহার যে এক **অন্তর্নিহিত অর্থপূর্ণ ভাবগম্ভীর** তাৎপর্য আছে মানুষ তা আজ ভুলে এর মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসে আর পাঁচটা উৎসবের মত শুধুমাত্র লোকাচারে পরিণত করে ফেলেছে।

রাখিবন্ধনের লক্ষ্য

বন্ধন দুরকমের হয়; এক হল ঈশ্বরীয় বন্ধন দুই হল সাংসারিক বা কর্মবন্ধন। ঈশ্বরীয় বন্ধনে সুখ আর সাংসারিক বন্ধনে দুঃখ হয়। রাখিবন্ধনকে আবার রক্ষাবন্ধনও বলা হয়। যা ঈশ্বরের সাথে কল্যাণকারী মহাদুর্লভ বন্ধন। ঘোর সংকটের সময় ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে ঈশ্বরীয় বন্ধন দ্বারা রক্ষা করেন। তিনি কীভাবে রক্ষা করেন সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি। লোকাচারে আমরা সাক্ষী - বোন ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। যে কোন মূল্যে বোনকে ভাই রক্ষা করবেই। এক সময় মুসলমানদের রাজত্বকালে হিন্দু নারীদের সতীত্ব রক্ষা এক মহান দায় ছিল। বোনেরা রাখি পরিয়ে ভাইদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় দেখার আশা পোষণ করতেন। বোনেরা কতখানি রক্ষা পেত তা ইতিহাস নীরব সাক্ষী। বর্তমান সময়েও বোনেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে ভাইদের কী হাল হচ্ছে তা সমাজ সাক্ষী। বিগত শতাব্দীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে সাড়ম্বরে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছেন।

মানুষের রক্ষার আশা পাঁচটি

১) **শরীরের রক্ষা-** প্রতিটি মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার শরীরকে। শরীর সুস্থ ও সুন্দর রেখে বেঁচে থাকতে চায়। শারীরিক কোন পীড়া আঘাত বা ক্ষতি সে চায় না। সর্বোপরি আপ্রাণ সে চেষ্টা করে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে কিন্তু অমোঘ নিয়মে তার শরীরের মায়া ত্যাগ করতে হয়। নিয়তির নিয়মকে স্বীকার করে নিতে হয়।

২) **ধর্ম, পবিত্রতা বা সতীত্ব রক্ষা** - নারীর মর্যাদা সতীত্বে। অতীতে বহু শাসনকর্তার মর্জিতে বহু নারীর পবিত্রতা ও মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছে। বহু পুরাণে ও কাহিনিতে ভুরি ভুরি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। দুই মহাকাব্যে সীতা ও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত সবার জানা। রাবণ ও দুঃশাসন বর্তমান সমাজেও দারুণভাবে হাজির। লাগামছাড়া কামুকতা বর্তমান সমাজে মায়েদের বোনেদের পবিত্রতা রক্ষা এক মহা চ্যালেঞ্জ। রাষ্টশক্তিও এর মোকাবিলায় হিমসিম খাচ্ছে। অবলা অসহায় নারী দুষ্ট শক্তির কাছে বারবার হার মেনে মর্যাদাহীন, সম্মানহীন জীবন কাটিয়েছে আজও সেই শঙ্কা থেকে সে মুক্তি পায়নি। কিন্তু মুক্তির আশায় বুক বেঁধে আছে। সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাধি থেকে সে আরোগ্য চায়।

৩) **মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা** - পৃথিবীর পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কেউ মৃত্যুকে বরণ করতে চায় না। দুনিয়া কাঁপানো কিছু ব্যক্তি, যেমন - আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার - এঁরা বহু মানুষকে হত্যা করেছেন কিন্তু মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। সবাই জানে মানুষ মরণশীল, কিন্তু আন্তরিকভাবে সে বিশ্বাস করেনা সে নিজে একদিন মরবে। যদি বিশ্বাস করত তাহলে অন্যকে পীড়া দিতে তার বিবেকে আটকাত। মানুষের অনিচ্ছা যতই হোক না কেন মৃত্যুকে তার বরণ করতে হয় বলে সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়।

৪) **সাংসারিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা** - পরিবার রূপী সংসার হোক বা রাষ্ট্ররূপী সংসার হোক উভয় সংসারের কর্তা চান না পরিজনের উপর কোন রূপ বিপদ-আপদের খাঁড়া নেমে আসুক। বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন্ সময়ে যে কোন্ দুর্ঘটনা একটা ছোট পরিবারে বা বৃহৎ রাষ্ট্রের ছন্দতে এলোমেলো করে দেবে তার নিশ্চয়তা নেই। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন গৃহকর্তা ভক্তি আদি সহ নানারকম উপায় অবলম্বন করেন, রাষ্ট্রও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। কখনো প্রকৃতির দ্বারা, কখনো মানুষের দ্বারা, কখনো-বা অন্যান্য উপদ্রব স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে টলিয়ে দেয়। দুর্যোগের ঘনঘটা এতটাই সর্বব্যাপী কখন যে কোনরূপে কীভাবে আছড়ে পড়বে তা কেউ জানে না। এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে চায় সবাই।

> *জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই মায়ার অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান*

৫) **মায়ার হাত থেকে রক্ষা** - মায়া কিন্তু প্রেম, দয়া বা অনুরাগ নয়। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন মায়া পাঁচ বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার। তাই তাঁরা মায়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য সাধনা করেন। কখনো কখনো মায়ার হাতে তাঁরাও পরাভূত হন। কাহিনিতে দেখানো হয় হাতিকে কুমীর গলাধঃকরণ করে ফেলেছে। এর মূল রহস্য হল জ্ঞানী ব্যক্তিগণও কখনো কখনো মায়ার কাছে হার স্বীকার করেন। এটাকে 'ইন্দ্রপতন' বলা হয়। বর্তমান বিশ্বসমাজের পণ্ডিত থেকে মূর্খ, সবল থেকে দুর্বল, বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে বয়োকনিষ্ঠ - বেশির ভাগ মানুষের মায়ার পরিচয় জানা নেই। ধারণা নেই মায়ার প্রভাব সর্বব্যাপী, নিজেই মায়ার বশ। বিশ্বাস করেন না দুঃখ, অশান্তি, রোগ, শোকের মূল কারণ এই পাঁচ বিকাররূপী মায়া। তাই তারা মায়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে চান না। এটাই হল বর্তমান পৃথিবীর মহাসংকট। এই মহাসংকট যতদিন পর্যন্ত না অনুভূত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মহা অস্থিরতা নিয়ে বিশ্ব চলবে। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই মায়ার অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান।

সার্বিক রক্ষা পেতে কোন্ রাখিবন্ধন চাই ?

আমরা জানি, বোন ভাইয়ের হাতে রাখি পরায়, কখনো কোন ব্রাহ্মণ রাখি পরায়! রাখি পরানোর পর মিষ্টিমুখ করায়! এই রাখি তৈরি হয় কোন ফুল বা কৃত্রিম কোন সুন্দর সরঞ্জাম দিয়ে। একটি সুতোর সাহায্যে হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এই রীতিনিয়ম চলে আসছে বহুদিন ধরে কিন্তু রাখির যে লক্ষ্য 'বিষহরক', 'পুণ্যপ্রদায়ক' পর্ব যার দ্বারা সংকটমোচন ও দুঃখভঞ্জন করে সুখ প্রাপ্ত হয় বাস্তবে কি তা হচ্ছে ? যদি হ'ত তাহলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাপাচার ভ্রষ্টাচারের বিষ দূর হয়ে ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠা হত।

(শেষাংশ চব্বিশ পৃষ্ঠায়)

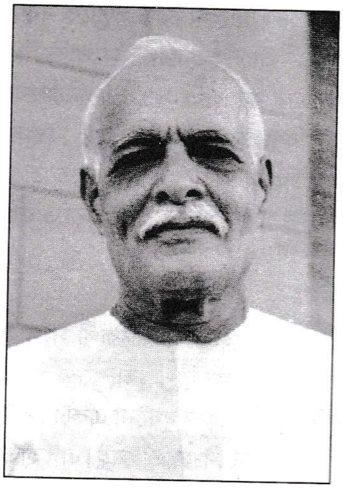

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

পূর্বপ্রকাশিতের পর

"ওম্ বাবা সম্বন্ধে আমি অনেক শুনেছি; কীভাবে, বাবার সৎসঙ্গে যারা গেছে, তারা মনের শান্তি পেয়েছে এবং দর্শনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সুতরাং একদিন আমি সেখানে যাই। আমি মনোযোগ দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করি এবং বুঝতে পারি যে, তারা যা বলেছিল সবই সত্যি। এক স্বর্গীয় শান্তি যেন বাবার দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছে। কেবল মাত্র তার সান্নিধ্যে থেকে আমি আনন্দ অনুভব করলাম।"

"বাবা আমায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? তুমি কি জান, তুমি কে?'
"আমি বললাম, 'আমি একজন অসুখী মহিলা।'
"পুনরায় বাবা প্রশ্ন করলেন, 'বল তো, এই পৃথিবী সুখে ভরা, না দুঃখে ভরা?'
"আমি বললাম, 'এই পৃথিবী প্রচণ্ড দুঃখে ভরা।'

"বাবা বললেন, 'বস', তিনি আমাকে তার পাশে বসালেন এবং একটি মানুষের চিত্র দেখিয়ে ভ্রূকুটির মাঝখানে আমাকে দেখালেন। তিনি সরলভাবে ব্যাখ্যা করলেন, 'দেখ, এই শরীর প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তৈরি - এটাও নশ্বর ও বিনাশী। কিন্তু এর মাঝে যে আত্মা আছে তাতে নিহিত আছে ভীষণ ক্রিয়াশীল শক্তি। যেমন, মন, বুদ্ধি, সংস্কার। আত্মা চৈতন্য শক্তি এবং অবিনশ্বর ও অবিনাশী। শরীর ও আত্মা এ দুটি আলাদা। শরীরের মৃত্যু হয় এবং তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করা হয়; আত্মাকে জ্বালানো যায় না। ইহা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। এখন তুমি বল, এ দুটির কোনটি তুমি? তুমি কি পাঁচতত্ত্ব দিয়ে গঠিত শরীর না তুমি আত্মা?

"আমি চমকিত হলাম। আমার চোখের উপর থেকে একটি পর্দা সরে গেল। আমি বললাম, 'বাবা, আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমি এক আত্মা।'

"বাবা উত্তরে বললেন, 'মা!, আত্মার প্রকৃতি হচ্ছে শান্তি। অশান্তি হচ্ছে প্রকৃতির স্বভাব। এই পাঁচতত্ত্বের মাঝে নিজের পরিচয় একাত্ম করলে, তুমি অশান্ত হবে। এখন বল, কে বলেছে, আমি এক অসুখী মহিলা? তুমি কি এক অসুখী মহিলা, না তুমি এক শান্তস্বরূপ আত্মা?'

"এই কথা শুনে আমি উদ্দীপনা বোধ করলাম। 'হ্যাঁ, আমি এক শান্তস্বরূপ আত্মা।' আমি বাবার কথার সত্যতা অনুভব করলাম। বাবা বললেন,' তোমার বুদ্ধি থেকে শরীর বোধ সরিয়ে নাও। অশরীরী হয়ে যাও। তোমার শাশ্বত ও অমররূপ - এক শান্তস্বরূপ আত্মার স্থিতিতে স্থিত হও। দেখ, তুমি কে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তোমার রূপ কি?'

"বাবা যখন এরূপ বলছিলেন, আমি অন্য এক চেতনার রাজ্যে পৌঁছে যাই। আমি শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাই। আমি দেখলাম, আমি এক আলোর বিন্দু, উর্ধ্বাকাশে উড়তে উড়তে পৌঁছাই এক অনন্ত অনাবিল আনন্দের রাজ্যে। আমি এরূপ সমাধিস্থ অবস্থায় প্রায় দু' ঘণ্টা ছিলাম।

''যখন আমি নীচে অবতরণ করলাম, বাবা আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' আমি বললাম, 'আমি এক আত্মা।' বাবা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এখন সুখী না অসুখী!' আমি বললাম, 'আমি শান্তস্বরূপ এক সুখী আত্মা।' আমার মত সুখী আর কেউ নেই।' বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পৃথিবী সুখী না অসুখী?' আমি বললাম, 'ইহা সুখী।' বাবা হাসলেন এবং পরে বললেন, 'ঠিক আছে, মনে রাখবে, স্মরণে রাখবে এবং আজকের পড়াকে অন্তঃস্থ করে নেবে। আগামীকাল তোমাকে অন্য পাঠ পড়াব।'

''সেই মুহূর্তে আমি একটি গান গাইতে শুরু করলাম ঃ

তুমি একটি শব্দ বললে, আর আমি জেগে উঠলাম,
গভীর নিদ্রা থেকে আমার হৃদয় জাগ্রত হল;
আমি জানি, আমি কে - শরীরে মোড়া এক আত্মা,
এই স্থূল গৃহ থেকে , আমি জানি কীভাবে উড়তে হয়।
এক মুহূর্তে তুমি আমায় যোগী বানিয়েছ,
তুমি আমায় সর্বোচ্চ নিবাসে নিয়ে গেছ,
আমি এক আত্মা, এই শরীর স্থূল পদার্থ,
আমি শাশ্বত, এই শরীর তো বিনাশী,
জ্ঞানদান করে , তুমি আমায় উচ্চ আসনে বসিয়েছ।
তুমি আমায় পবিত্রতার পথ দেখিয়েছ।
গভীর নিদ্রা থেকে আমায় তুমি জাগিয়ে তুলেছ।

আত্মার প্রকৃতি শান্তি।
অশান্তি প্রকৃতির স্বভাব।
পাঁচতত্ত্বের মাঝে নিজের
পরিচয় একাত্ম করলে
অশান্ত হবে।

''যখন আমি বাবার কাছে আসছিলাম, আমি কাঁদছিলাম কিন্তু এখন দিব্য আনন্দের মাদকতা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। বাড়ি ফিরে আমি মাকে সব বললাম। তিনি আমার মাঝে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তার দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,'তুমি কাঁদছ কেন? আত্মা অবিনাশী, শাশ্বত। তুমি সেই শান্তস্বরূপ শাশ্বত আত্মা।' এই কথা শুনে তিনি এক নতুন শক্তি অনুভব করলেন। তার হতাশা যেন মুহূর্তের জন্য লোপ পেল। তিনি আমায় বাবার জ্ঞান শোনার জন্য রোজ যেতে বললেন এবং ফিরে এসে তাকে সব শোনাতে বললেন। এর কিছুদিন পরে, একদিন আমি আমার দুঃখী মায়ের কথা বাবাকে বললাম। বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তাকে দেখতে যাব।' সেই মুহূর্তে বাবা তৈরি হয়ে, আমাদের গৃহে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

''বাবাকে দেখেই আমার মা সম্মোহিত হলেন এবং নিজের আসল রূপ অনুভব করলেন। মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপের দর্শন লাভ করেন। এক অনাবিল শান্তি তার মুখমণ্ডলে দেখা দিল। দীর্ঘক্ষণ ধরে মা গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। নীচে নেমে এসে মা বাবার প্রতি অতি মধুর হাসি হাসলেন। শান্তভাবে বাবা জ্ঞান ব্যাখ্যা করেন।''

এইভাবে অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তিলাভ করেন। তারা অনুভব করল যে, ঈশ্বর, দুঃখ, অশান্তি দূর করে, সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

‘‘যখন আমি নীচে অবতরণ করলাম, বাবা আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কে?’ আমি বললাম, ‘আমি এক আত্মা।’ বাবা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি এখন সুখী না অসুখী!’ আমি বললাম, ‘আমি শান্তস্বরূপ এক সুখী আত্মা।’ আমার মত সুখী আর কেউ নেই।’ বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই পৃথিবী সুখী না অসুখী?’ আমি বললাম, ‘ইহা সুখী।’ বাবা হাসলেন এবং পরে বললেন, ‘ঠিক আছে, মনে রাখবে, স্মরণে রাখবে এবং আজকের পড়াকে অন্তঃস্থ করে নেবে। আগামীকাল তোমাকে অন্য পাঠ পড়াব।’

‘‘সেই মুহূর্তে আমি একটি গান গাইতে শুরু করলাম ঃ

তুমি একটি শব্দ বললে, আর আমি জেগে উঠলাম,
গভীর নিদ্রা থেকে আমার হৃদয় জাগ্রত হল;
আমি জানি, আমি কে - শরীরে মোড়া এক আত্মা,
এই স্থূল গৃহ থেকে , আমি জানি কীভাবে উড়তে হয়।
এক মুহূর্তে তুমি আমায় যোগী বানিয়েছ,
তুমি আমায় সর্বোচ্চ নিবাসে নিয়ে গেছ,
আমি এক আত্মা, এই শরীর স্থূল পদার্থ,
আমি শাশ্বত, এই শরীর তো বিনাশী,
জ্ঞানদান করে , তুমি আমায় উচ্চ আসনে বসিয়েছ।
তুমি আমায় পবিত্রতার পথ দেখিয়েছ।
গভীর নিদ্রা থেকে আমায় তুমি জাগিয়ে তুলেছ।

আত্মার প্রকৃতি শান্তি।
অশান্তি প্রকৃতির স্বভাব।
পাঁচতত্ত্বের মাঝে নিজের
পরিচয় একাত্ম করলে
অশান্ত হবে।

‘‘যখন আমি বাবার কাছে আসছিলাম, আমি কাঁদছিলাম কিন্তু এখন দিব্য আনন্দের মাদকতা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। বাড়ি ফিরে আমি মাকে সব বললাম। তিনি আমার মাঝে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তার দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,‘তুমি কাঁদছ কেন? আত্মা অবিনাশী, শাশ্বত। তুমি সেই শান্তস্বরূপ শাশ্বত আত্মা।’ এই কথা শুনে তিনি এক নতুন শক্তি অনুভব করলেন। তার হতাশা যেন মুহূর্তের জন্য লোপ পেল। তিনি আমায় বাবার জ্ঞান শোনার জন্য রোজ যেতে বললেন এবং ফিরে এসে তাকে সব শোনাতে বললেন। এর কিছুদিন পরে, একদিন আমি আমার দুঃখী মায়ের কথা বাবাকে বললাম। বাবা বললেন, ‘ঠিক আছে। আমি তাকে দেখতে যাব।’ সেই মুহূর্তে বাবা তৈরি হয়ে, আমাদের গৃহে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

‘‘বাবাকে দেখেই আমার মা সম্মোহিত হলেন এবং নিজের আসল রূপ অনুভব করলেন। মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপের দর্শন লাভ করেন। এক অনাবিল শান্তি তার মুখমণ্ডলে দেখা দিল। দীর্ঘক্ষণ ধরে মা গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। নীচে নেমে এসে মা বাবার প্রতি অতি মধুর হাসি হাসলেন। শান্তভাবে বাবা জ্ঞান ব্যাখ্যা করেন।’’

এইভাবে অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তিলাভ করেন। তারা অনুভব করল যে, ঈশ্বর, দুঃখ, অশান্তি দূর করে, সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

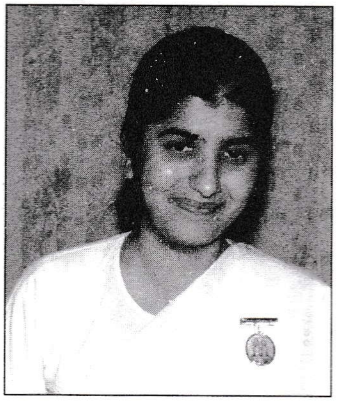

সময়কে ব্যর্থ নষ্ট করার অর্থ অন্তর্নিহিত শক্তিকে নষ্ট করা

- ব্রহ্মাকুমারী শিবানী

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ সময় আমাদের মনোযোগ থাকে নিজের আশেপাশে বা অন্যেরা কে কী করছে ; নিজেকে নিয়ে ভাববার অভ্যাস কীভাবে আয়ত্ত হ'তে পারে?

উত্তর ঃ এর জন্য প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ হবে না আমি কতখানি ভুল করছি। আমাদের এক-একটি ব্যর্থ নির্ণেয় অন্তর্নিহিত শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। আমি বসে বসে অন্যের কথা যতই ভাবি না কেন, এতে কোন লাভ হয় না। কারণ, আমার হিসাবে তো তারা চলবে না। বরং নিজের সম্বন্ধে যদি ভাববার জন্য এই শক্তিকে কাজে লাগাই তাহলে অবশ্যই কিছু করতে সক্ষম হব।

যত আমি নির্ণায়কের ভূমিকা নেব ততই আমি নিরাশা উৎপন্ন করব। ধরা যাক্- কোন সিনিয়র তার জুনিয়রকে বারবার কিছু বলছে কিন্তু সে তা তো মানছেই না উপরন্তু নিজের মতো করে চলেছে তাহলে এখন উপায় কী? এতে নিরাশা আসবে আবার রাগও হবে। এর দ্বারা আমরা নিজের ধৈর্যের সীমারেখা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসি। কারণ, রাগ হলে কেউ সঠিক চিন্তা করতে পারে না বা সঠিক নির্ণয় করতে পারে না। এর অর্থ হল কিছু সময়ের জন্য প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া। এরকম দৃশ্য কেন উৎপন্ন হ'ল? কারণ ব্যক্তি নিজে নিজের থেকে বাইরে চলে যায়। পরিস্থিতির প্রভাবে নিজেকে প্রভাবিত করে নিয়েছে, যার কারণ নিজের ক্রিয়াশীলতায় সে অক্ষম হয়ে গেছে।

নিজেকে দেখার অভ্যাস করলে বোধ আসবে আমার জন্য কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। অন্যকে দেখা তো খুব সহজ কিন্তু একদিন নিজেকে দেখলে অনুমান হবে বিষয়টা সহজ কিনা! যে কোন ব্যক্তি আপনাকে দেখে বলে দেবে, আপনার কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক। কিন্তু আমরা একে অপরকে পরিবর্তন করতে পারব না। তবে নিজেরা যদি নিজেদের দেখা শুরু করি যে আমার জন্য কোনটা ঠিক, তাহলেই নিজের কাছেই আশ্চর্য লাগবে, বিষয়টা কতখানি ইতিবাচক।

ব্রহ্মাকুমারীজে আমাদের শেখানো হয় 'আমি যখন বদলাব, তখন দুনিয়া বদলে যাবে'। আমাদের স্লোগান - 'স্ব-পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বপরিবর্তন'। এই ধারণায় প্রথমে তো আমি বদলাব আমাকে ঘিরে সারা সংসারই বদলে যায়। এর সাথে এক বিশাল কল্যাণ লুকিয়ে আছে, যদি আমরা এভাবে এক-এক করে বদলাতে শুরু করি তাহলে পৃথিবীর পরিবর্তন এমনিতেই হয়ে যাবে। 'স্ব-পরিবর্তন' এই পদক্ষেপের এক সরল বিধি। কিন্তু আমরা এই বিধিকে কঠিন করে দিয়েছি এই ভাবনা রেখে - প্রথমে তুমি বদলাও তারপর আমি বদলাব।

প্রশ্ন ঃ আমার নির্ভরতা যদি অন্যের উপর হয় তাহলে আমার দৃষ্টিকোণ অবশ্যই তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না?

উত্তর ঃ অবশ্যই, কারণ আমার নির্ভরতা বহির্মুখী। দ্বিতীয় বিষয় হল আমার খুশির ধারা যে অন্যের উপরই নির্ভরশীল। আমরা এ পর্যন্ত অন্যের উপর বহু নির্ভরতা তৈরি করে রেখেছি। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারবে ততক্ষণ পযন্ত তার খুশির স্তর নীচেই নামতে থাকবে। ধরুন, আমার বস্ আজ সময়মত আসেননি, আমার আশা ছিল প্রত্যহ যেমন আটটার সময় আসেন তেমনি আজও আসবেন। যেহেতু তিনি আটটার সময় আসেননি তো আমার খুশির স্তর নীচে নেমে গেল। আমাদের নিজেদের নিজেকে চেক করতে হবে আমরা এভাবে কোন কোন ব্যক্তির উপর নির্ভরতা করে রেখেছি, তাহলে নিজেরও হুঁশ হবে আমার উপর কোন কোন ব্যক্তি নির্ভরতা তৈরি করে রেখেছে।

বিনয়ী রাষ্ট্রপতি

একবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। রাস্তার এক পাশে এক ইমারতের নির্মাণ হচ্ছিল। নির্মাণ কার্য তিনি খুব মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। তিনি দেখলেন এক মজদুর একটা বড় পাথর আপ্রাণ চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। পাথরটা সত্যিই বেশ ভারী ছিল। পাশে দাঁড়ানো ঠিকাদার বেশ মেজাজে মজদুরকে বকাঝকা করছেন। ওয়াশিংটন ঠিকাদারের কাছে গিয়ে বললেন, মজদুরকে সাহায্য করুন না, যদি আর একজন পাথরটাকে তুলে দেয় তো কাজটা হয়ে যায়। বেচারা ঠিকাদার রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনকে চিনতে পারেননি। তিনি মেজাজ হারিয়ে শুনিয়ে দিলেন, আমি মজদুর নই, মজদুরদের দিয়ে মজদুরি করাই। একথা শুনে ওয়াশিংটন ঘোড়া থেকে নামলেন। মজদুরের কাছে গেলেন এবং তাকে পাথর তুলে সাহায্য করলেন। পাথরটা সহজেই উপরে উঠে গেল। ওয়াশিংটন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। ঠিকাদারকে 'সেলাম' করে সবিনয়ে বললেন, ঠিকাদার সাহেব যদি কখনো একটা লোকের অভাব অনুভব হয় তাহলে আপনি দয়া করে রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে জর্জ ওয়াশিংটনকে একটু স্মরণ করবেন। একথা শুনে ঠিকাদার রাষ্ট্রপতির পায়ে পড়ে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ওয়াশিংটন বিনম্রতার সঙ্গে বললেন, পরিশ্রম করলে কোন ব্যক্তি ছোট বা বড় হয়ে যায় না। শ্রমিকদের সহযোগিতা করলে বরং আপনি ওঁদের সম্মান আদায় করতে সক্ষম হবেন। জীবনে নিজেকে উঁচুতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজের ব্যবহারে ভীষণ বিনয়ী হ'তে হবে। সেদিন থেকে ওই ঠিকাদারের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হয়েছিল। ওয়াশিংটনের বিনয়ের শিক্ষা তার জীবনে অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছিল

প্রভুমিলন

- বি. কে. এঞ্জেলা

জীবনে আমরা আনন্দের সন্ধান করি সকলেই। কারণ দুঃখ আমরা কেউ চাই না। আমরা চাই শান্তি; কারণ শান্তি আমাদের স্বধর্ম। কিন্তু আমরা জাগতিক বিষয় থেকে শান্তি চাই বা শান্তি ও আনন্দ খুঁজবার চেষ্টা করি। যে জগৎ স্থায়ী নয় সে জগতের আনন্দ কীভাবে স্থায়ী হবে? এই কারণেই আমরা শান্তি পাই না। এই শান্তি পাবার জন্য প্রবেশ করতে হবে আমাদের মনেরই অন্তঃস্থলে। জীবনের সব ক্ষেত্রে আন্তরিক শক্তি প্রয়োজন যা তাকে এগোতে সাহায্য করে। এর জন্য প্রতিদিন একবার করে প্রভুমিলনের অনুভূতি আনা প্রয়োজন। ঈশ্বর এক অনুভূতি। এখন কীভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সম্ভব। আমরা জানি পাখিরা উড়তে ভালোবাসে। পাখিকে সোনার খাঁচায় রাখলেও, ভালো খাবার দিলেও সে চায় মুক্ত বাতাস, সে চায় স্বাধীনতা, সে চায় মুক্তি।

ঠিক তেমনি মানুষও মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে চায়। সেও চায় পাখির মতো উড়তে। কিন্তু উড়বার কলা (Art of flying) তার জানা নেই। উড়বার জন্য চাই দুটো ডানা, হালকা শরীর, অনুশীলন এবং তার সঙ্গে চরম উৎসাহ। পাখি যখন ওড়ে তখন খারাপ আবহাওয়া, ধুলো, ঝড় সবকিছু উপেক্ষা করে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি। পাখি হল তার মন ও বুদ্ধি। মানুষকেও তেমনি সবকিছু উপেক্ষা করে হালকা মন, বুদ্ধি, মোহমুক্ত স্থিতি রাখতে হবে। এর সঙ্গে প্রয়োজন শান্ত ভাব, উৎসাহ ও সর্বোপরি ঈশ্বরপ্রেম।

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য উড়তি কলা (Art of flying) শেখা দরকার। এর জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

১) **দেহ অভিমান ত্যাগ ঃ** সর্বদা মনে রাখতে হবে আমি এক 'আত্মা'। আমার শরীর রূপী গাড়ির ড্রাইভার আমি। এটাই আমার আসল পরিচয়। এই দেহরূপী পোশাক আমার অল্পদিনের জন্য। সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে আমি অভিনেতা। আমার অভিনয় শেষ হলে এই জীর্ণ পোশাক আমি এখানেই ছেড়ে চলে যাবো। আমার বাস্তবিক স্বরূপ আমি এক বিন্দু। এই বিন্দু স্থিতি যখন অনুভব করব তখনই নিজেকে হালকা মনে করবো ও পাখির মতো উড়বো। অতএব দেহ অভিমান ত্যাগ ঈশ্বর মিলনের প্রথম শর্ত।

২) **মোহমুক্ত স্থিতি ঃ** দেহ অভিমান ত্যাগ করার জন্য মোহমুক্ত হতে হবে। গীতার কথা মনে রাখো ঃ "তুমি কী হারিয়েছ, যার জন্য তুমি আক্ষেপ করছো? তুমি কী নিয়ে এসেছিলে যা তোমার এখানে হারিয়ে গেছে? তুমি কী সৃষ্টি করেছিলে যা নষ্ট হয়ে গেছে? যা কিছু তুমি পেয়েছ সব এখানে এসে পেয়েছ। তুমি সংসারে খালি হাতে এসেছ, খালি হাতেই যাবে। আজ তোমার যা কিছু গতকাল তা অন্যজনের ছিল, আগামীকাল তা অন্য কারোর হবে, তুমি ভ্রান্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছো যে এসবই তোমার। এই ভ্রমই তোমার দুঃখের কারণ"। গীতার এই কথাগুলো সর্বদা মনে রাখা দরকার। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন মৃতদেহ দেখেন ও বোঝেন এর থেকে পরিত্রাণের কোনো

উপায় নেই। তখন মৃদুস্বরে বলে ওঠেন, ‘‘আহা, দেহ ধুলোয় মিশে যাবে জেনেও তোমরা মোহাচ্ছন্ন’’। এই বিষয়গুলো যখনই অনুভব করবো তখনই আমরা মোহমুক্ত হবো। আমরা বুঝবো এই পৃথিবী আমাদের Guest House এবং তখন অনন্ত জীবনলাভের জন্য মন ও বুদ্ধিরূপী পাখা লাগিয়ে মোহমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চরম উৎসাহ নিয়ে উড়বো।

৩) **নিমিত্ত ভাব ঃ**এই মোহমুক্ত স্থিতি আনার জন্য নিমিত্ত ভাব অনুভব করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে হবে ‘‘প্রভু এ সংসারে আমার বলে কিছু নেই - সবই তোমার’’। আমি কেবল নিমিত্ত বা ট্রাস্টি। গীতার কথা মনে রাখতে হবে - কাজ করে যাও কিন্তু ফলের আশা করো না। নিমিত্ত ভাব এলে অহংকার আসে না। দেহ ভাব বা body consciousness দূর হয়। এই গুণই উড়তে সাহায্য করে।

৪) **দৈবীনেশা ও ঈশ্বরপ্রেম ঃ** অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি এলে দৈবী নেশা আসে। যখন স্থূল, সূক্ষ্ম সব বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত থাকি, তখন আসে আমাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। পাখি যতদূর খুশি ওড়ে। ওরা কারোর কথা শোনেনা। তেমনি আত্মারূপী পাখির বুদ্ধিরূপী পা যখন চলে যাবে শরীররূপী আকর্ষণের ওপর, তখনই হবো আমরা অবতার। এজন্য ব্যর্থ চিন্তা মন থেকে সরাতে হবে। বলা হয়, An empty mind is devil’s workshop but an ideal mind is God’s workshop. লোকসংখ্যা বেশি হলে যেমন লিফ্‌ট চলে না তেমনি অতিরিক্ত চিন্তা ত্যাগ না করলে আমরা হালকা হবো না ও উড়তে পারবো না। অতীতের ভাবনা ভুলতে হবে। সর্বদা গীতার কথা ভাবতে হবে যা হয়েছে তা ভালো, যা হচ্ছে তা ভালো, যা হবে তা আর ভালো। সর্বোপরি, ঈশ্বরপ্রেম আমাদের উড়তে সাহায্য করে। বলা হয়, love knows no laws অর্থাৎ ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোন আইনের সীমারেখা নেই। ঈশ্বরপ্রেম অনুভব করার জন্য পুরুষার্থ প্রয়োজন। মন-বচন-কর্মে সমান থাকলে বুঝতে হবে তীব্র পুরুষার্থী। ওড়ার খুশি, উৎসাহ রাখতে হবে। তবেই প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উড়বো আর বলবো ঃ

> *অতিরিক্ত চিন্তা ত্যাগ না*
> *করলে আমরা হালকা*
> *হবো না ও উড়তে*
> *পারবো না*

আমি উড়ন্ত এক পাখি / ছেড়েছি সব সাথি
উড়েই আমি যাবো /তোমরা মিছেই ভাবো
আঁধি আসুক, তুফান আসুক / কোন বাধাই মানবো না
কারোর কথাই শুনবো না / উড়েই আমার শান্তি
আসবে নাকো ক্লান্তি / ওই গগনের ওপার
আছে আমার সকল সার / ওখানেতে আমার খুশি
আমার সকল সুখ / বাঁধবো নতুন বুক
পড়বো নতুন বাসা / এই তো আমার আশা

সর্বশক্তিমান কে ?

- ব্রহ্মাকুমার স্বপন,
কলকাতা মিউজিয়াম

স“র্বশক্তিমান”-এই শব্দটুকুর মধ্যে কত ‘মোহ’, কত ‘শক্তি’, কত ‘গাম্ভীর্য’, কত ‘অহমিকা’ প্রকাশিত হয়, কত ইতিহাস রচিত হয়ে যায়! আমরা কি কেউ কোনদিন সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি? ‘সর্বশক্তিমান’ আসলে কে? তার সংজ্ঞা কী? যে নিজমুখে বলে সে ‘সর্বশক্তিমান’- সে কি তাই?

বিজ্ঞানের বিকাশেরও বহু আগে যুক্তিবাদী মানুষের মন বলেছে ‘সূর্য’ (অগ্নির স্বরূপ) সর্বশক্তিমান, পরে প্রকৃতি থেকেই দেখতে পেলো সূর্যকেও তো ‘মেঘ’ (জলের রূপান্তর) ঢেকে দেয়-জল অগ্নিনির্বাপণ করে দেয়-তো ‘মেঘ’ বা জল ‘সর্বশক্তিমান’। আবার দেখলো ‘বায়ু’ মেঘকে তাড়িত করে-বায়ুই সমুদ্রে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে-জলের ধারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে - তো ‘বায়ু’ সর্বশক্তিমান। পরে দেখলো বায়ুকেও বাধা দেবার শক্তি ‘পাহাড়’ (ক্ষিতি বা মাটির রূপান্তর)-এর আছে - তো পাহাড় বা ক্ষিতি সর্বশক্তিমান। পরে দেখলো - তাও তো নয় - ওই যে গুটি গুটি পায়ে একটি ‘মানুষ’ সুউচ্চ পাহাড়ের উপর উঠে তাকে জয় করার নিদর্শন হিসাবে স্বীয় দেশের পতাকা তুলে দেয় তার সঙ্গে, স্বীয় পদচিহ্ন রেখে যায় তার শৃঙ্গে। আবার প্রয়োজন হলে একটু একটু করে হলেও ওই বিশাল ‘পাহাড়’কেও কেটে শেষ করে দিতে পারে, তখন থেকে সে এই সিদ্ধান্ত নিল যে - না, ‘চেতন মানুষ’ই সর্বশক্তিমান।
মানুষ সামাজিক প্রাণী - সে একা থাকতে পারে না। তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্যও সাহায্যের প্রয়োজন। সেভাবেই পরিবার-সমাজ-রাজ্য-সাম্রাজ্যের গঠন-পতন দেখা যেতে লাগলো। প্রবল প্রতাপান্বিত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ‘মহারাজা’কে সমস্বরে প্রজারা বলেছিলো - মহারাজা, আপনিই সর্বশক্তিমান। কিন্তু বুদ্ধিমান মহারাজা বেশ কৌতুকপূর্ণভাবেই বলেছিলেন, দেখ, তোমরা সবাই আমার আদেশ অনুসারে চলো। কিন্তু আমি আমার সহধর্মিনী, যাঁকে তোমরা ‘রানিমা’ বলো, তাঁকে খুশি করার জন্য চলি। আবার দেখ সেই রানিমাও তাঁর সর্বমনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তাঁর কোলে যে ছোট্ট শিশুটি আছে - তার জন্য। তাহলে তোমরাই বলো ‘সর্বশক্তিমান’ কে হলো ?

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে, পারিবারিক-সামাজিক-আর্থিক-চারিত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন রাত্রির অন্ধকার সুন্দর চিত্রের মতো বিরাজমান তারামণ্ডলী তাদের আকার, দূরত্ব, বৈচিত্র্য, শক্তির আভাস দেওয়া শুরু করলো, তখন বিস্ময়াবিষ্ট মানুষের কাছে এই প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দেখা দিলো ‘কে সর্বশক্তিমান ?’ আবহমান চলতে থাকা দিনরাত্রি, ঋতু পরিবর্তন - প্রাকৃতিক দৃশ্যকলার নিয়মমাফিক পরিবর্তন মানুষের মনে প্রশ্ন তুলে দেয় - কে এই বিশাল সৃষ্টির রচয়িতা, নিয়ামক সর্বশক্তিমান ?

শক্তিশালী, আর্থিকভাবে বলীয়ান মানুষের কাছে নিপীড়িত হয়ে নিরীহ দুর্বল মানুষ আকুল হয়ে আর্তনাদ করে ‘হে সর্বশক্তিমান’, ‘হে কৃপাময়’- বাঁচাও! এই আর্তনাদ তার স্মৃতির অতল গভীর থেকে উঠে আসে, সাধককুলের ধ্যানময়তায় ভিতরে দর্শন ও উপলব্ধির ভিতর থেকে উঠে আসে। এই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের নির্যাস দিয়ে, বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, অনুমান ইত্যাদি দিয়ে শুধু এটুকুই বোঝা যায় - এই সর্বশক্তিমান / মহাশক্তির কোনো পার্থিব বস্তু / ব্যক্তি বা সীমিত শক্তিধারী কেউ নয়। তবে তিনি কে বা কী তাঁর রূপ, কীভাবে তিনি কাজ করেন - তা কিছুই জানা গেল না। এদিকে আস্তে আস্তে নৈতিক অধঃপতনের সাথে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ করতে পরমাণু বোমার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে পৃথিবী তার

অস্তিত্ব রক্ষারই শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো।

সেই অন্তিমকালের ‘বিন্দু’ আগে থেকে এক অতি অদ্ভুত কিন্তু অতি প্রিয় শক্তির আবির্ভাব হলো পৃথিবীতে যিনি এক অদ্ভুত কাজ শুরু করলেন আজ থেকে ৭৬ বছর আগে। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই বহুজন তাদের ‘স্মৃতি’গুলো ফিরে পেতে লাগলো - একত্রিত হতে লাগলো - বিস্ময় আর মুগ্ধতায় তাঁর ‘আধার মুখ’ নিঃসৃত বাণী শুনতে শুনতে তারা শুধুমাত্র পুলকিত, আশ্বস্তই নয় সাথে সাথে স্বীয় পরিবর্তন দ্বারা শুধুমাত্র স্বয়ং পরিপক্ক হতে লাগলো তাই নয়, সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সামগ্রিক পৃথিবীর উন্নতির প্রচেষ্টায় নিরলস প্রয়াস করে চললো।

কিন্তু সেই স্বয়ং আবির্ভূত, অতি অদ্ভুত শক্তির কাছ থেকে কী কী শোনা গেল ? তিনি শুধু নিজেরই পরিচয় দিলেন না - তিনি সকলের পরিচয় জানালেন, কর্মের গুহ্যগতির কথা শোনালেন, খাস ভারতের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনালেন যার সঙ্গে সারা পৃথিবীর ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। তিনি শোনালেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত পরিচয়। কিছু বিজ্ঞানীর অহং/অন্ধবিশ্বাসীর ‘বদ্ধমূল ধারণায়’ তৈরি ‘বিং ব্যাং থিয়োরি’ ধূলিসাৎ করে একটা অবিনাশী ‘চলমান বাস্তবের’ কাহিনি। স্বীয় পরিচয় দেবার সময় তিনি বললেন, তিনি ‘জ্ঞানস্বরূপ’, ‘প্রকাশস্বরূপ’, ‘আনন্দস্বরূপ’, তিনিই ‘পতিতপাবন’ - যে কাজটা তিনি কল্প-কল্প করে যান, সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যুর ওপারে থাকেন, তিনি তাঁর সন্তানদেরই ফলপ্রদান করেন আর ভক্তদের দর্শনাদি দিয়ে তাদের স্বীয় মনোকামনা পূর্ণ করেন। তিনি বিশ্বের সকলকে তাঁর সন্তান স্নেহে দেখেন। পরম বিনয় এবং স্নেহের সঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমিই তোমাদের পিতা, তোমাদের শিক্ষক, তোমাদের একমাত্র সদগুরু-আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পাপের হাত থেকে মুক্ত হতে পারো - অন্য কোনো উপায়ে নয়।

আবার পরম বিনয়ের সঙ্গে বলেন ঃ-

১) আমিও কিন্তু এই বিশ্বনাটকের/ড্রামা দ্বারা আবদ্ধ-আমিও এটা থেকে আলাদা কিছু করতে পারি না।

২) এও বলেন ‘মায়া’ সর্বশক্তিমান - সর্বব্যাপী। বর্তমানে সারা মনুষ্য সৃষ্টি মায়ার কবলে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন। মায়া দুরতিক্রম্য - এমন কী বাবার ‘মহাবীর সন্তানরাও’ পরাজিত হয় মায়ার কাছে। অর্ধেক কল্প আমার সন্তানদের রাজ্য থাকে আর অর্ধেক কল্প ‘মায়ার’ রাজ্য।

তাহলে প্রশ্ন হলো - ‘সর্বশক্তিমান’ কে ? উত্তর খুঁজতে হলে একটু ‘লজিক’-এর প্রয়োজন - যেটা ‘পরমাত্মা’ আমাদের দিয়েছেন।

প্রথমেই ‘ড্রামা’কে আমরা সরাতে পারি - কারণ ‘ড্রামা’ নিজে একটা ‘শক্তি’ নয় - যা ঘটে যায় সেটাই ‘ড্রামা’ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ মায়া বর্তমানে সর্বব্যাপী হলেও ‘অবিনাশী’ নয়। মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো মায়ার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বর্তমান ‘সঙ্গম’ যুগে এই মায়ারই সম্পূর্ণ পরাভব ঘটে ও মায়া ভস্মীভূত হয়ে নতুন দৈবীরাজ্যের পত্তন হয়। ২৫০০ বছর ধরে চলতে চলতে একটু একটু করে ময়লা জমতে জমতে ‘মায়ার’ উৎপত্তি হয়। ‘পরমাত্ম’ শক্তির কাছে পর্যন্তও সে যেতে পারে না - যেমন আলো আসা মানেই অন্ধকারের বিনাশ।

তাহলে শেষপর্যন্ত ‘সর্বশক্তিমান’ কে স্থির হলেন ? কে আবার ? সেই ‘স্বয়ম্ভূ’, ‘জ্ঞানসাগর’, ‘চিরপবিত্র’, আনন্দস্বরূপ’, ‘অদ্বিতীয়’, ‘অবিনশ্বর’ পরমাত্মা শিব।

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

- ব্রহ্মাকুমারী মৌসুমী
গড়ফা

আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল ধর্মের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, তার কারণ আমার পারিবারিক বাতাবরণ। প্রত্যহ দেখতাম ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা, দিদিমা, দাদু, বাবা, মা - সকলে যে যার সময়মত সকাল সন্ধে গৃহে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীর মূর্তিতে ভক্তিভরে পুজো করতে, প্রণাম করতে সেটাই আমার জীবনের প্রতিদিনের অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। এছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই থাকতো। একটা গান ছোট থেকেই শুনে এসেছি আর তার কথাগুলোও নিজের অজান্তে বিশ্বাসও করে ফেলেছি। গানটি হলো - সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে আমি করি। অর্থাৎ এ জগতে সবকিছুই যে তিনিই নিয়ন্ত্রণ-কর্তা, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না। এসব শুনেই বড় হয়ে উঠেছি।

কিন্তু বড় হয়ে একি বুঝতে , জানতে, দেখতে পাচ্ছি? সংবাদপত্র পড়লেই জানছি সর্বত্র একি মানুষের আচরণ ও পরিণতি - অনাহার, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, চরম দরিদ্রতা, চুরি, ডাকাতি, বধূহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, সর্বত্র অসততা, অপবিত্রতার ছাপ, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্কর রূপ যার পরিণাম মানব জীবনে শুধুই অশান্তি দুঃখ। এসব দেখেশুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। বহু গুরুজনের কাছে জানতে চেয়েছি, ধর্মের নানা বই পড়েছি, কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতে সব কিছু হচ্ছে এমন কি এসব অনাচারও স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে যা ঘটছে, এ কেমন করে সম্ভব ? যে ঈশ্বর স্বয়ং করুণাময়, জগতের সৃষ্টিকর্তা, মঙ্গলময় তিনি কিনা এসকল অপকর্ম উপর থেকে করাচ্ছেন আর আমরা শুধু তার হাতের পুতুল হয়ে এসকল ধ্বংসাত্মক কর্ম করে চলেছি। না, না কিছুতেই হিসাব মেলে না।

কোথাও যে একটা ভুল হচ্ছে অনুভব করতাম কিন্তু ভুলটা ধরতে পারতাম না। টিভিতে হঠাৎ একদিন 'আস্থা' চ্যানেলে একটা প্রোগ্রাম-এ চোখ আটকে গেল। যদিও অনুষ্ঠানটি আধ্যাত্মিক কিন্তু আর পাঁচটা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন। এখানে পূজাপাঠ বা তার নিয়মকানুন শেখায় না। শেখাচ্ছে অধ্যাত্মকে জীবনে ধারণ করতে। কোন কুসংস্কার নেই, আছে এতদিন ধরে অভ্যস্ত কিছু বদ অভ্যাসের বদলানোর পথ। কথায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে থেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, যেমন - সংসার ও তার নিত্যদিনের কাজ, কর্মের মধ্যে থেকে শুধু বদলাতে বলছে নিজেকে। শক্তিশালী চিন্তাকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যের দিক হতে ব্যর্থ চিন্তা থেকে বিরত থেকে কি করা উচিত, ভাবা উচিত সেদিকে মনোনিবেশ করে নিজের মানসিক অবস্থাকে সর্বপরিস্থিতিতে শান্ত, আনন্দ ও খুশিতে ভরে রাখার আধ্যাত্মিক পথকে অবলম্বন করা। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-১০ থেকে ৭-৪০ আস্থা চ্যানেলে "অ্যাওয়েকনিং উইথ ব্রহ্মাকুমারীজ" অনুষ্ঠানটি আমার জীবনের ধারণাকে বদলে দিতে শুরু করল। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়-এর কলকাতার ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, তাদের কাছে কোর্স করলাম ৭ দিনের। আমার এতদিনের খুঁজে চলা

সকল প্রশ্নের হাতে পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। এই বিদ্যালয় আমাকে জ্ঞান সাগরে ডুবিয়ে নতুন জন্ম দিল; আমি তৃপ্ত হলাম, ধন্য হলাম।

জানলাম জগতের সকল অশান্তির কারণ হলো মানুষ তার স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মকে আপন করায়। এই স্বধর্ম হলো প্রেম, আনন্দ, শান্তি, পবিত্রতা, সুখ, জ্ঞান ও শক্তি - এই সপ্তগুণে সমৃদ্ধ আত্মা। মানুষ আজ নিজেকে আত্মার বদলে দেহ বলে বিশ্বাস করে। আত্মার বিপরীত ধর্মের আচরণ অর্থাৎ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, অসততা, অসহযোগিতা, মিথ্যা ইত্যাদি সকল অপবিত্রতা জীবনে গ্রহণ করেছে। সকল পবিত্র সংস্কার চাপা পড়ে বিপরীত সংস্কার তৈরি হয়েছে। স্বধর্ম ত্যাগ করে বিকর্ম করতে শুরু করে, যে বিকর্মের ফসল নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজ ও সারা বিশ্বে ডেকে আনে অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট। সকল দুঃখের কারণ তো জানলাম। এর থেকে মুক্তির উপায় কি ?

স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা নতুন করে জ্ঞান সাগরে ডুবিয়ে, আমাদের দেহ অভিমান থেকে মুক্ত করে নিজেকে পবিত্র, অবিনাশী আত্মা এবং পরমপিতা পরমাত্মার সন্তানরূপে অনুভব করতে শিখিয়ে, পরমাত্মার সকল সম্পদের অর্থাৎ সাগর সমান শান্তি, সুখ, আনন্দ, পবিত্রতার উত্তরাধিকার হিসাবে নিজেকে জানতে শিখিয়ে, আত্মার স্বগুণ, স্বধর্মকে জাগ্রত করার পাঠ পড়াতে শুরু করেছেন। ব্রহ্মাবাবার শরীরে তিনি অবতরণ করে রাজযোগ দ্বারা স্বপরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তনের সহজ উপায় জানিয়েছেন। আমাদেরই শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। শুরু তাই আমাকে করতে হবে সেটাই হবে নিজের এবং জগৎ সংসারের সেবা।

> *তাঁর পবিত্র স্পর্শ আমার*
> *অতি ক্রোধী স্বামীর*
> *মধ্যেও যেন কিছুটা*
> *পরিবর্তন এনে ফেলেছে*

পরম সাধকের গাওয়া গানের সঠিক অর্থও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সকল কর্ম তিনিই করছেন এ জ্ঞান আসলে আমাদের অহংবোধ যাতে না তৈরি হয়, আমি করছি, বলছি, দিচ্ছি - এ চিন্তায় অহংকার জন্মাতে পারে তাই অহংকে জয় করার উপায় হলো সকল কর্ম তাঁর জন্যই করছি এটাই মনে রাখা। সাধকের গানের সঠিক অর্থ আমি বুঝতে ও অনুভব করতে শিখলাম, ধন্য হলাম।

যখন থেকে জেনেছি দুনিয়ায় এরূপ দুঃখ-অশান্তি, হিংসা-ঈর্ষা দূর হয়ে সুখ-শান্তিপূর্ণ, আনন্দে ভরপুর, ধনধান্যে পুষ্পে ভরপুর, সুখ-সমৃদ্ধে ভরে উঠতে চলেছে তখন থেকেই মন আনন্দে নাচতে শুরু করেছে। সবাই বলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর শিববাবা জানালেন নতুন পবিত্র পৃথিবী সৃষ্টি হতে চলেছে। জ্ঞানের সাগরে ডুব দিয়ে অপবিত্রতা ধুয়ে পবিত্র হয়ে উঠবো। আমরা স্বপরিবর্তনের দ্বারা দুনিয়ায় পবিত্রতা আনবো। স্বর্ণযুগ স্থাপিত হবে। অতএব আমার চিন্তা, কর্ম ও বচনে স্বর্ণযুগের সংস্কারের পরিচয় দিতে হবে।

আমি এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়ে স্ব-পরিচয়, স্বধর্ম-এর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ভগবান পিতার সাথে যোগযুক্ত হয়ে তাঁর স্পর্শে নিজেকে তো পরিবর্তন করে চলেছি। পিতার যোগস্পর্শ শুধু আমাকে নয় আমার সারা গৃহে একটা শান্ত বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। তাঁর পবিত্র স্পর্শ আমার অতি ক্রোধী স্বামীর মধ্যেও যেন কিছুটা পরিবর্তন এনে ফেলেছে। সে যদিও যোগ করে না শুধু আমার সদা সুখী-হর্ষিত-শান্ত-প্রসন্ন ভাবটার সঙ্গ অনুভব করে। পিস অফ মাইন্ড টিভিতে নিয়মিত আমার সাথে রাজযোগের কথা শোনে তাতেই তার চিন্তার প্রচুর পরিবর্তন আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করে ফেলেছি, আমি বাবার অতি স্নেহধন্য সন্তান, তাঁর অসীম করুণার বর্ষণে আমি নতুন জন্ম পেয়েছি। আজও যেটুকু আচরণে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে তা যে খুব শীঘ্রই শোধন হবেই তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে হালকা-অনুভব করতে শুরু করেছি। "বাবা আপনে কামাল কর দিয়া" গানটা সর্বক্ষণ কানের কাছে, মনের ভিতর বাজতে থাকে। আমি ধন্য হলাম তোমার স্নেহের স্পর্শে।

- তের পৃষ্ঠার পর

কিন্তু জীবন্ত চিত্র এই যে দিনের পর দিন লাগামছাড়া ন্যায়নীতি ভাঙার খেলা বেড়েই চলেছে। সারা পৃথিবী বিশেষ করে ভারতের সর্বত্র মানুষের সার্বিক চারিত্রিক অবক্ষয়ের নগ্ন রূপ। এটাই ধর্মের অতি গ্লানি। মানুষ পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট, দিশাহীন হয়ে ধাক্কা খেয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে। মানুষ জ্ঞানহীন তাই দৃষ্টিহীন। মহাসংকটের শিকার। ঠিক এরকম সময় সকল মনুষ্যাত্মার পিতা স্বয়ং ঈশ্বর 'শ্রীমৎ' রূপী রাখি বিশ্ববাসীকে উপহার দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন। এটাই প্রকৃতপক্ষে রক্ষা-বন্ধন। যা প্রদান করে ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। ভগবান শ্রীমতে দুটো প্রধান বিষয় দান করেন তাহল সুখসমৃদ্ধি লাভের জন্য 'নিয়ম ও মর্যাদার জ্ঞান' এবং সেই জ্ঞান বাস্তবে প্রতিফলনের জন্য 'যোগশক্তি'। এই দুইয়ের সম্মিলনে পূর্বে উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের রক্ষা এই মুহূর্ত থেকেই আমরা পেতে থাকব। শরীর ঘিরে দুশ্চিন্তা নয়, নারীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য বলহীন হওয়া নয়, অকাল মৃত্যুর ভয় নয়, সাংসারিক দুর্যোগ নয়, পাঁচ বিকারের যন্ত্রণা আর নয়। এসব বিদায় নেবে আগামী আড়াই হাজার বছরের জন্য। 'সত্য শিব সুন্দর' ভগবানের এই রাখি পরতে হলে ব্রহ্মাকুমারীজের যে কোন সেবাকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। ঈশ্বরের আদেশে ব্রহ্মাকুমারীজ প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী প্রকৃত রাখিবন্ধনের সেবায় উৎসর্গীকৃত। পৃথিবীর বর্তমান মহাসংকট থেকে যতদিন না উদ্ধার পায় ততদিন এই প্রতিষ্ঠানের নিরলস সেবা চলতে থাকবে। ঈশ্বর প্রদত্ত শ্রীমৎ-ই পৃথিবীর মহাসংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। জীবনে শ্রীমৎ ধারণই প্রকৃত রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা।

কার্শিয়ং ঃ
'ভাগবত কথা' অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দীপ প্রজ্জ্বলন করছেন ভ্রাতা মহেন্দ্র প্রধান, সভাসদ, সোনাদা, দার্জিলিং; সঙ্গে বি. কে. দুর্গা এবং বি. কে. বন্দনা।

দার্জিলিং ঃ
গুরুদেব গুরুং রিম্পোছে - কে ঈশ্বরীয় উপহার দিচ্ছেন বি. কে. মুন্না সাথে বি. কে. রাজ এবং বি. কে. প্রমোদ।

কলকাতা ঃ
হলদিরাম্‌স্‌-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঈশ্বরীয় সন্দেশ দিচ্ছেন বি. কে. চন্দ্রা, সাথে বি. কে. মাধুরি।

দিল্লী (লোধি রোড) ঃ
অয়েল ইন্ডিয়া লিঃ (ভারত সরকার)-এর কর্পোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত 'প্রকৃতির সামঞ্জস্য' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছেন বি. কে. পীযূষ, ভ্রাতা শ্রী রথ (ডাইরেক্টর, পরিচালন) এবং অন্যান্যরা।

Vol.2, Issue 3, RNI No.WBBEN/2012/42493, Aug - Sep 2013, Price ₹10/- only

কলকাতা (মিউজিয়াম) ঃ
ঈশ্বরীয় সন্দেশ প্রদান শেষে ভূটান রাষ্ট্রদূত ভ্রাতা দাসো ওয়ংদাজির সাথে বি. কে. কানন, বি. কে. মুন্নি ও অন্যান্যরা।

কলকাতা (বরানগর) ঃ
ভ্রাতা সাধন পাণ্ডে (M.I.C., Consumer Affairs, Govt. of W.B.) ও ভ্রাতা অবিনাশ উপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ) মহোদয়দের ঈশ্বরীয় নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন বি. কে. পিঙ্কি।

কলকাতা ঃ ব্রহ্মাকুমারিজ ও ইমামি চিজেল আর্ট দ্বারা আয়োজিত 'ওম কাফে' অনুষ্ঠানে 'লয়্যালিটি' বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বি. কে. শান্তনু, বি. কে. চন্দ্রা, বি. কে. রুমকি ও বি. কে. অঞ্জনা।

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.